

উপবৃত্তির টাকাও আত্মসাৎ

ভাগ যায় কর্মকর্তাদের পকেটে

মুসতাক আহমদ

নানাভাবে লুটপাট হচ্ছে গরিব ছাত্রছাত্রীদের জন্য নেয়া সরকারের উপবৃত্তি প্রকল্পের অর্থ। ভুয়া শিক্ষার্থী দেখিয়ে বিভিন্ন উপজেলায় এ অর্থ আত্মসাৎ অব্যাহত আছে। এছাড়া কর্মশালা ও সমাবেশ আয়োজনের নামেও ভুয়া বিল, ভাউচার ও প্রতিবেদন দাখিল করে অর্থ হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনের কেনাকাটায় দুর্নীতি অনেকটা ওপেন সিক্রেট। আবার আকস্মিক অভিযান চালালে প্রকল্পের মালামাল সর্বশেষ পদস্থ কর্মকর্তাদের বাসা-বাড়িতেও পাওয়া যাবে। অভিযোগ উঠলে বলা হয়, প্রকল্পের পুরনো মালামাল। অনেক সময় স্টোরে মালামালের ষ্টক রেজিস্টার হয় না। এছাড়া অফিসের গাড়ি প্রকল্প পরিচালকের বাসায় ও আত্মীয়স্বজনের পেছনে ব্যবহার করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা এক অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রকল্পের একজন কর্মকর্তা জানান, ষষ্ঠ থেকে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি দেয়া হয়। এর মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প ১৮৩ উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার মধ্যে গাইবান্ধা ও রংপুরের কয়েকটি উপজেলায় সম্প্রতি উপবৃত্তির কার্যক্রম তদন্তে যায় কর্মকর্তারা। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ ও রংপুর সদরে বেশি শিক্ষার্থী দেখানোর প্রমাণ মেলে। প্রায় সারা দেশেই ভুয়া শিক্ষার্থীর মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা লোপাটের অভিযোগ আছে। ৬ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ছয়টি প্রকল্পের অর্থবার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়। তাতেও ভুয়া শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেয়ার তথ্য তুলে



প্রকল্পের মালামাল চলে যায় কর্মকর্তাদের বাসায়

সব জানলেও মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায় নিরুপ

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

উপবৃত্তির টাকাও আত্মসাৎ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধরা হয়। দুর্নীতি রোধে প্রতিবেদনে সব প্রকল্পের জন্য মনিটরিং বৃদ্ধি, উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ডাটা কালেকশনে জটিলতা নিরসন, অভিন্ন পদ্ধতিতে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। বলা হয়, অভিন্ন পদ্ধতি প্রবর্তিত হলে ভুয়া এবং দ্বৈত শিক্ষার্থী পরিহার ও চিহ্নিত করা যাবে। প্রকল্পের অর্থ লুটপাটের একটি বড় খাত হচ্ছে (প্রকল্পভুক্ত) বিভিন্ন উপজেলা ভ্রমণ। কর্মশালা এবং 'মা' সমাবেশ বাস্তবায়নের জন্য এসব ভ্রমণ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক (পিডি) ও অন্য কর্মকর্তারা কোথাও না গিয়ে দৈনন্দিন পরিবহন ও ভ্রমণ ব্যয় হিসেবে লাখ লাখ টাকা বিল তুলে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, গত অর্থবছর প্রকল্পভুক্ত উপজেলাগুলোতে ৩শ'টি মা সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল। প্রতি উপজেলায় ২টি করে এ ধরনের সমাবেশে ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। সেগুলো কোথাও হয়নি, আবার কোথাও দায়সারাতাবে হয়েছে। প্রকল্প অফিস থেকে এগুলো মনিটরিং না করায় মাঠপর্যায়ে এ অর্থ যেমন আত্মসাৎের অভিযোগ আছে, তেমনি 'মা' সমাবেশকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বরাদ্দকৃত লাখ লাখ টাকা ভাগবাটোয়ারা করে নেয়া হয়। সূত্র বলছে, এ ধরনের মা সমাবেশে অংশ নেয়া প্রকল্প অফিসের কর্মকর্তা মুখ্য আলোচক থাকেন। অংশ নেয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। কিন্তু ২৪ এপ্রিল তাইমুর রহমান নামে সহকারী প্রকল্প পরিচালক সমাবেশে যোগদানের একটি জাল প্রতিবেদন জমা দেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রায় ১৫ হাজার টাকাও তুলে নেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, ওই প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার স্বাক্ষরের সঙ্গে মিল নেই। এর থেকেই জাল প্রমাণিত হয়। উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মশালাও হয়ে থাকে প্রকল্পের অধীনে। এক একটি কর্মশালার জন্য সাড়ে ৩ লাখ টাকা বরাদ্দ থাকে। নিয়মানুযায়ী যখন যে এলাকায় কর্মশালা হবে, সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে এর বাজেট পাঠিয়ে দিতে হবে। অথচ তা না করে প্রকল্প অফিস থেকে প্যাড, কলম, ফোন্টার ইত্যাদি নিম্নমানের উপকরণ কিনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এছাড়া কর্মশালায় না গিয়ে ভুয়া বিল-ভাউচারে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ তো আছেই।

অপরদিকে মালামাল কেনার নামে ভুয়া ভাউচারে অর্থ লুটপাটের অভিযোগ তো পুরনো। আছে স্টোরের মালামাল আত্মসাৎের অভিযোগ। স্টোরের মালামাল কেনাকাটা ও সংরক্ষণে সরকারি বিধিবিধান অনুসরণ করা হয় না। ক্রয়কৃত মালামালের ষ্টক রেজিস্টারে এন্ট্রি নেই। অভিযোগ আছে, পুরনো মালামাল রেজিস্টারে রেখে নতুন মালামাল বাসায় নিয়ে যেতেন এর আগের পিডি। সেই ধারাবাহিকতা বজায় আছে। স্টোরে মূল্যবান কোনো মালামাল নেই। ক্রয় তালিকা এবং ষ্টক তদন্তে এর সত্যতা বেরিয়ে আসবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

প্রকল্পের গাড়ি ব্যবহারেও অনিয়ম ও জ্বালানি লুটপাটের অভিযোগ প্রকট। অফিসের কাজের জন্য কেনা প্রকল্পের গাড়ি অননুমোদিতভাবে বাসায় রেখে দেন পিডি। ফলে দাফতরিক কাজের পরিবর্তে তা পারিবারিক এবং আত্মীয়স্বজনের সুবিধার্থে সারাক্ষণ ব্যবহার হচ্ছে। ফলে প্রকল্পের কর্মকর্তারা গাড়ি পান না। বাসে-গাড়িতে করে যাতায়াতের কারণে প্রকল্পের কর্মকর্তারা দেরিতে অফিসে আসেন, আবার আগে চলে যান।

এ প্রকল্পের বেশকিছু জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর হয়েছে। অপরদিকে আগে সরাসরি বা ব্যাংকের মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণ করা হতো। তাতে নানা অনিয়ম, লুটপাট-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এসব ঠেকাতে এখন একটি বেসরকারি

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। এ কারণে প্রকল্পের কাজ কমে গেছে। তা সত্ত্বেও গরিব ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দের উপবৃত্তির টাকায় পোষা হচ্ছে মাথাভারি প্রশাসন। এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রকল্পের অর্থ লুটপাট হয় বলে অনেক কর্মকর্তা আড়ল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছেন। 'ত' আদ্যাক্ষরের একজন কর্মকর্তা ইতিমধ্যে মোহাম্মদপুরের বসিলায় ফ্ল্যাট কিনেছেন। উত্তরার দিয়াবাড়ীতে নামে-বেনামে কিনেছেন একাধিক প্লটও। অফিসের গাড়ি নিয়ে প্রায়ই সেখানে ওই কর্মকর্তা যান বলে প্রকল্পের একাধিক গাড়ি চালক যুগান্তরকে এ তথ্য জানান।

এ প্রকল্পে বিভিন্ন উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে ৫ জন কর্মচারী সংযুক্তি হিসেবে আনা হয়। তাদের মধ্যে অন্তত দু'জন কর্মকর্তা নানা দুর্নীতির রাজস্বাঙ্গী বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। সূত্র জানান, এ প্রকল্পে বর্তমানে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে ১০-১৫ বছর ধরে থাকা উল্লিখিত ৫ কর্মচারীর প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এসব কর্মচারীর পদায়ন ছিল সমাপ্ত 'সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্টে।' সেই হিসাবে বর্তমান প্রকল্পে তাদের অবস্থান সম্পূর্ণ বেআইনি। তাদের যেসব উপজেলা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, সেখানে জনবল সংকট আছে। কক্সবাজারের রামু উপজেলায় মাত্র ২ জন কর্মচারী আছেন। অথচ সেখান থেকে আনা এমএলএসএস একেএম মহিউদ্দিন আছেন প্রকল্প অফিসে। আবার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা থাকা সত্ত্বেও রহস্যজনক কারণে পিডি কর্মচারী মহিউদ্দিনকে দিয়ে হিসাব বিভাগের কাজ করানো হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করে প্রকল্পের একাধিক কর্মকর্তা জানান, দাগী কর্মকর্তাই যেন এই প্রকল্পের ভাগ্যলিখন হয়ে গেছে। আগের পিডি ৮২ ব্যাচের কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও একাধিক বিভাগীয় মামলা এবং নেতিবাচক ভাবমূর্ত্তির কারণে উপসচিব পদের বেশি যেতে পারেননি। তারপর আসা বর্তমান পিডির মাথায়ও ঝুলছে বিভাগীয় মামলা। তার (৮৬) ব্যাচের অধিকাংশ কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিব। কিন্তু তিনি এখনও উপসচিব পদেই আছেন। এই দুই কর্মকর্তার বাসা-বাড়ি অনুসন্ধান করলে প্রকল্পের মালামাল পাওয়া যাবে বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের।

এসব বিষয়ে জানতে প্রকল্প পরিচালক (পিডি) শরীফ মোর্তজা মামুনের কার্যালয়ে গিয়ে কথা বলা সম্ভব হয়নি। পরে তার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনে ৮ বার কল করলেও তিনি তা রিসিভ করেননি। এমনকি ক্ষুদে বার্তা পাঠানোর পরও ফোর ধরেননি।

সহকারী প্রকল্প পরিচালক তাইমুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, কর্মশালা, মা সমাবেশসহ প্রত্যেক কাজের জন্য প্রতিবেদন, খরচের জন্য ভাউচার দিতে হয়। সুতরাং প্রকল্পের অর্থ অপচয় বা আত্মসাৎের কোনো সুযোগ নেই। তিনি কর্মশালায় না গিয়ে প্রতিবেদন দাখিলের তথ্য স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে তার দাবি কর্মশালা শেষ হওয়ার পর তিনি সেখানে গেছেন। কেনাকাটা ও ষ্টক রেজিস্টার প্রসঙ্গে তাইমুর রহমান বলেন, 'আমি এসব দেখাশোনা করলেও কেনাকাটা হয় একটি কমিটির মাধ্যমে। ষ্টক রেজিস্টারও মেইনটেন করা হয়। যারা অভিযোগ করছেন তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, ভুয়া ও মিথ্যা।' তিনি দাবি করেন, প্রকল্পের গাড়ি অফিসের কাজেই ব্যবহৃত হয়, কারও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের সুযোগ নেই।

তবে প্রকল্পের কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পিডিসহ এতে দীর্ঘদিন কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যাংক হিসাব এবং প্রকল্পে কেনাকাটার ভাউচারসহ অন্যান্য দিক তদন্তে লুটপাটের চিত্র বেরিয়ে আসবে।

উল্লেখ্য, সম্পূর্ণ সরকারি অর্থে প্রায় ৭৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি নামে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।